সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়

সম্রাটের নতুন মন বনাম সম্রাটের পুরোনো মন

["...'FEEL LIKE ? Oh, ...a most interesting question, my lad... er...Ultronic says...it can't even understand what you're getting at !'...
Adam felt acutely embarrassed. Whatever they should have done, they should not have laughed."

— Roger Penrose, *The Emperor's New Mind*, Vintage, 1990.]

মন ও বস্তু, বা আরো সাধারণভাবে চেতনা ও জড়, এ-দুয়ের সম্পর্কের সমস্যাটা বেশ পুরোনো। দর্শনচিন্তার বিভিন্ন প্রধান স্রোত খুব সম্ভব এই সমস্যা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। রজার পেন্‌রোজের *The Emperor's New Mind* বইটি এই সমস্যারই এক আধুনিক পর্যায়ের পটভূমিকায় লেখা। ঐ বইটিই এখানে আলোচ্য।

একটা কথা। আলোচনায় কিছু সাংকেতিক চিহ্নের দরকার হবে। তাদের মানেও সাধ্যমতো বুঝিয়ে বলা হবে। তবু কোনো কোনো পাঠক যদি এতে অসুবিধে বোধ করেন, তাঁদের প্রতি অনুরোধ যে তাঁরা যেন চিহ্নগুলো উপেক্ষা করে লেখাটার সংগে এগিয়ে চলেন।

ওপর ওপর বললে, বইটিতে পেন্‌রোজের উদ্দেশ্য হল কৃত্রিম ধীমত্তার (Artificial Intelligence) প্রবক্তাদের এই মত খণ্ডন করা যে অনাগতভবিষ্যতে (বা কখনও) সম্ভব হবে আমাদের চেতনার **প্রধান সব** কাজই কম্পিউটার দিয়ে করানো। পেন্‌রোজ মতটির নাম দিয়েছেন "strong AI"— যার বাংলা করা যায় "জোরালো কৃত্রিম ধীমত্তা", সংক্ষেপে জো. কৃ. ধী.। তাই এখানে 'জোকৃধী' বলেই আমরা মতটির উল্লেখ করব।

জোকৃধী, কম্পিউটার ও অ্যালগরিদ্‌ম্

জোকৃধীবাদীদের মোদ্দা কথা এই যে ওসব চেতনা-ফেতনা ফালতু ব্যাপার (— এক

ধরনের একগুঁয়ে জড়বাদও যা ভজিয়ে থাকে !—), আসলে প্রযুক্তিগত কিছু পদক্ষেপ ঠিকঠাক নেওয়া হলে কম্পিউটারকে দিয়ে মানবচেতনার প্রধান কাজগুলো করাতে পারা অসম্ভব কিছুই নয় !

নেহাৎ মন্দ নয় এঁদের যুক্তি ! একটি লোক যখন ২ আর ২ যোগ করে বলে ৪, আর একটা কম্পিউটার যখন ঐ একই কাজ করে— এঁদের মতে উভয়েই তখন একটা বিশেষ কার্যক্রম (algorithm) অনুযায়ীই কাজটা করে। ফলে, এঁরা বোঝান, চেতনার থাকা বা না-থাকা ঐ অংকটা ঠিকভাবে করার কাজকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না। কেননা, এখানে ঐ কার্যক্রমটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরেকটু তাত্ত্বিকভাবে বললে, এঁদের বক্তব্য হল প্রকৃতির মধ্যে যান্ত্রিক কার্যক্রমগুলির জটিলতার বৃদ্ধি একটা বিশেষ মাত্রা পার হলেই প্রকৃতিতে চেতনার উন্মেষ ঘটে। অর্থাৎ, চেতনার কাজগুলি শুধু যে কার্যক্রমভিত্তিক তাই নয়, বরং প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জটিলভাবে কার্যক্রম-ভিত্তিক ! আর, চেতনার মূলে ক্রিয়াশীল এই অতিজটিল কার্যক্রমগুলোকে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তে আনা তত্ত্বগতভাবে অসম্ভব কিছু নয় !

পেনরোজ এই মতবাদের বিরোধিতা করেছেন। এছাড়াও দেখিয়েছেন কীভাবে এর বিরোধিতা করেও কেউ কেউ জোরুধীবাদের (—নাকি এক ধরনের অন্ধ জড়বাদের ?—) ফাঁদ এড়াতে পারেননি। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন এমন মতের কথা যা বলে যে নিয়মনিয়ন্ত্রিত যে-কোনো কিছুকেই যেহেতু এক ধরনের কম্পিউটার হিসেবে ভাবা যায়, অতএব আমাদের মস্তিষ্ককেও ঐভাবে ভাবা যেতে পারা উচিত ! এখানে পেনরোজের বক্তব্য, কোনো কিছু নিয়মনিয়ন্ত্রিত হলেই তাকে যে কম্পিউটার হিসেবে ভাবা চলবে এমন কথা ঠিক নয়। কেন নয়, সে-কথাই বুঝিয়েছেন তিনি বইটিতে।

একটা কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে ? এককথায় বললে, আগে থেকে নির্দিষ্ট কোনো-না-কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে। এখানে 'কার্যক্রম' মানে কার্যের ক্রম— অর্থাৎ, সুবিন্যস্ত ও সুসংজ্ঞাত কিছু কাজ— যেগুলি একটার পর একটা করা হয়— কাজগুলির নির্দিষ্ট ক্রম বা বিন্যাস ঠিক রেখে। এবার প্রশ্ন : মানুষ তার চেতনার সাহায্যে যেসব 'কাজ' করে থাকে, সবসময়েই কি তাদের ভিত্তি হিসেবে কোনো কার্যক্রম থাকে ? পেনরোজ বলছেন, না ! এবং জানাচ্ছেন যে এমনকি গণিত, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রেও — এবং প্রাণহীন জড়প্রকৃতিতেও— এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ 'কাজ' আছে, যাদের গোড়ায় কোনো কার্যক্রম নেই !

ব্যাপারটা প্রথমে যত সোজা মনে হতে পারে ততই সোজা কিন্তু নয় ! এ-কথা বোঝা খুব সোজা নয় যে প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত মানবচেতনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজই কোনো

কার্যক্রমের বাঁধাধরা ছকের বাইরে সাধিত হয়ে থাকে! আরো শক্ত একথা বোঝা যে এমনকি গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রে-বাঁধা জগতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই কোনো কার্যক্রমের নাগালের বাইরে! তবে একটা যুক্তি-পরম্পরা হয়তো এর মধ্যেই উঠে আসছে! আমাদের চেতনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অ-কার্যক্রমাভিত্তিক। কম্পিউটারের সব কাজই কিন্তু আবশ্যিকভাবে কার্যক্রমাভিত্তিক। অতএব···

ট্যুরিং যন্ত্র

যেকোনো কার্যক্রমের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা কেমন হবে? এমন একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছিল ১৯৩০-এর দশকে। 'ট্যুরিং যন্ত্র' এই গবেষণারই একটি প্রধান, এবং পেন্‌রোজের মতে প্রধানতম, ফল। অবশ্য ট্যুরিং যন্ত্র সত্যিসত্যিই কোনো যন্ত্র নয় (—কথাটা যদিও 'ট্যাশগরু গরু নয়'-গোছের শোনায়)! আসলে এটি একটি ধারণা, একটুকরো বিমূর্ত গণিত— যেটি ইংরেজ গণিতবিদ্ অ্যালান্ ট্যুরিং নির্মাণ করেন ১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গণিতের একটি বিরাট সমস্যার সমাধান বার করা। সমস্যাটির উদ্ভাবক জার্মান্ গণিতবিদ্ ডেভিড্ হিল্‌বার্ট্ এবং হিল্‌বার্টের স্থিরীকরণ সমস্যা (Enscheidungsproblem) নামে সমস্যাটি গণিতের দুনিয়ায় বিখ্যাত।

হিল্‌বার্ট্ খুঁজছিলেন এমন এক সামান্য বা সার্বিক (universal) কার্যক্রম যা সাধারণভাবে গণিতের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। তিনি ভেবেছিলেন, অমন একটি কার্যক্রম তৈরী করা গেলে গণিতকে এক অলঙ্ঘ্য অবশ্যম্ভাবিতার ভিতের ওপর দাঁড় করানো যাবে। ফলে যেকোনো গাণিতিক অবধারণের (সহজ বাংলায়, জাজ্‌মেন্টের) সত্যিমিথ্যে যাচাই করা যাবে ঐ ভিত্তিভূমির সাহায্যে। আসলে হিল্‌বার্ট্ চেয়েছিলেন এভাবে গাণিতিক সত্যকে পদ্ধতির এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শক্তপোক্ত কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে— যে কাঠামো হবে স্ববিরোধমুক্ত— এবং কোনো গাণিতিক সত্য কখনোই যার বাইরে থাকতে পারবে না। এভাবেই ট্যুরিং খুঁজেছিলেন এমন কোনো যান্ত্রিক কার্যক্রম— যা গণিতের অন্ততঃ কোনো একটি শাখার সব সমস্যাগুলোরই একের পর এক সমাধান দিয়ে যেতে পারে। অবশেষে ট্যুরিং যন্ত্রেই এরকম এক যান্ত্রিক পদ্ধতির খোঁজ পান তিনি।

কাল্পনিক এই যন্ত্রের আসল বৈশিষ্ট্য এই যে এটিকে দিয়ে বিবিধ সাংকেতিক লিপি পড়ানো ও লেখানো যায়। আবার এটিকে দিয়ে কোনো গণনাক্রিয়ার জন্য দরকারী কার্যক্রমের নির্দেশগুলোও পড়ানো যায়। কোনো গণনাক্রিয়ার সময়ে যন্ত্রটি বিভিন্ন সাংকেতিক

লিপি পড়তে থাকে— এবং কোনো কার্যক্রম অনুযায়ী ওগুলির ওপর কাজ করে চলতে থাকে— যতক্ষণ না পুরো কাজটা শেষ হয়। তারপর যন্ত্রটি থামে এবং গণনার উত্তর সংলগ্ন কোনো মাধ্যমের ওপর লিখে দেয়।

পেন্‌রোজ দেখিয়েছেন যে ছোট ছোট পাটিগাণিতিক গণনা থেকে শুরু করে অনেক বেশি জটিল সব ক্রিয়ার জন্যেও বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমের উপযোগী ট্যুরিং যন্ত্র তৈরী করা যায়। লক্ষ্য করুন, এখানে একটা কার্যক্রমকে একটা ট্যুরিং যন্ত্রের প্রধানতম অংগ বলে ধরা হচ্ছে! এক কথায়, যে-কোনো ক্রিয়া যার ক্ষেত্রে কার্যক্রম (algorithm) এই বিশেষ্যটি, অথবা, যান্ত্রিক (mechanical), গণনীয় (computable), পুনর্নির্দেশক (recursive), কার্যকরী (effective) প্রভৃতি বিশেষণগুলি প্রযোজ্য— সেই সমস্ত ক্রিয়াকেই কোনো বিশেষ ট্যুরিং যন্ত্রের ক্রিয়া বলে ভাবা যায়। আর, পেন্‌রোজের মতে, যেকোনো কম্পিউটার আসলে এক ধরণের সার্বিক (universal) ট্যুরিং যন্ত্র— মানে, এমন এক ট্যুরিং যন্ত্র যাকে দিয়ে যেকোনো বিশেষ ট্যুরিং যন্ত্রের কাজ করানো যায়।

'যেকোনো ট্যুরিং যন্ত্রের কাজ করানো যায়'? কিন্তু কতগুলো ট্যুরিং যন্ত্র তৈরী করতে পারি আমরা? তালিকাটা যে মস্ত লম্বা হবে তা বোঝা সহজ। মজা এই যে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে তালিকাটা বানাতে গেলে দেখা যায় যে বিশাল-সংখ্যক এই ট্যুরিং যন্ত্রগুলোর অধিকাংশই নিতান্ত 'অকেজো'! অকেজো এ-অর্থে যে ঐসব ট্যুরিং যন্ত্রগুলি হয় কখনো না থেমে অনর্থক কাজ করে যেতে থাকে, নইলে কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ আটকে পড়ে!

তালিকাটা ঐ অকেজো যন্ত্রগুলোকে বাদ দিয়ে বানানো যায় না? একটু ঘুরিয়ে বললে, প্রশ্ন হল এমন কোনো কার্যক্রম আছে কি না যার সাহায্যে আগে থেকেই বলা যাবে কোনো একটি ট্যুরিং যন্ত্র থামবে, না থামবে না। পেন্‌রোজ প্রশ্নটির নাম দিয়েছেন 'ট্যুরিং যন্ত্রের সমাপন-সমস্যা'। আর, তাঁর মতে, অমন কোনো কার্যক্রম থাকতে পারে না!

সমাপন-সমস্যা ও হিল্‌বার্ট্‌-সমস্যা

আমরা জানলাম যে যেকোনো কার্যক্রমকেই কোনো ট্যুরিং যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। উল্টোভাবে, যেকোনো ট্যুরিং যন্ত্রকে কার্যক্রম বলে ভাবা যেতে পারে। তাই ট্যুরিং যন্ত্রের সমাপন-সমস্যাকে কার্যক্রমের সমাপন-সমস্যা হিসেবেও ভাবা

যায়। ফলে, সহজেই বোঝা যায় যে সমস্যাটির সমাধান সমস্ত গাণিতিক সমস্যার কার্যক্রমভিত্তিক সমাধানযোগ্যতার প্রশ্নের সংগে— অর্থাৎ হিল্‌বার্টের স্থিরীকরণসমস্যার সংগে— খুব সরাসরি জড়িত। তাই সমস্যাটির আলোচনায় 'ট্যুরিং যন্ত্র' শব্দটার বদলে আমরা 'কার্যক্রম' শব্দটাই ব্যবহার করব। আর, ট্যুরিং যন্ত্রের ঐ তালিকাকে আমরা ভাবব কার্যক্রমের তালিকা হিসেবে।

এবার কিছু প্রতীক কাজে লাগবে আমাদের। যেমন, কার্যক্রমগুলোকে আমরা বোঝাব কাজ, কাঁচাকাজ, পাকাকাজ প্রভৃতি নাম দিয়ে। ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে বোঝানো হবে বিভিন্ন সংখ্যা। আমাদের তালিকার 'ক'-তম কার্যক্রমটিকে বোঝানো হবে কাজ [(ক)···] প্রতীকটি দিয়ে। অর্থাৎ, এখানে 'ক'-এর জায়গায় ১ বসালে প্রতীকটা বোঝাবে আমাদের তালিকার প্রথম কার্যক্রম, ২ বসালে দ্বিতীয় কার্যক্রম ইত্যাদি।

বেশ! এবার ধরুন, ক-তম কার্যক্রম কোনো বাস্তব সংখ্যা 'স'-এর ওপর ক্রিয়া করে যে ফলটা দেয় সেটা আরেকটা বাস্তব সংখ্যা 'ফ'। এই লম্বা বাক্যটা আমরা বোঝাব স্রেফ এইভাবে :

কাজ [(ক) স] = ফ

মনে রাখবেন, এখানে 'স'-এর জায়গায় 'ক' বসালে পাওয়া যেতো 'ক'-সংখ্যাটির ওপরই ক-তম কার্যক্রমের ক্রিয়ার ফল। কিন্তু ক-তম কার্যক্রম যদি 'অকেজো' হয়? তখন অবশ্যই কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না! তখন আমরা লিখব :

কাজ [(ক)···] = ?

প্রশ্নচিহ্নটা এখানে বোঝাবে যে ক-তম কার্যক্রমের কোনো উত্তর নেই। আর সবশেষে, প্রতীকটার চৌকো ব্র্যাকেটের (বা বন্ধনীর) ভেতর ঐ গোল ব্র্যাকেট্‌টা না থাকলে বুঝতে হবে আমাদের তালিকায় কার্যক্রমটার ক্রমিক সংখ্যাটা নিয়ে আমরা ভাবছি না। যেমন ধরুন, পাকাকাজ [স] বোঝাবে 'স'-এর ওপর ঐ কার্যক্রমের ক্রিয়ার ফল, কার্যক্রমটার ক্রমিক সংখ্যা যাই হোক না কেন।

এবার ফেরা যাক সমাপন-সমস্যায়। এখানে প্রশ্ন হল এমন কোনো কার্যক্রম আছে কি না যা ঠিকঠিক বলতে পারবে কোনো একটা কার্যক্রম অকেজো কি না। ধরুন, অমন একটি কার্যক্রম সত্যিই আছে। ধরা যাক সেটির নাম কাঁচাকাজ। (নামকরণের

সার্থকতাটা এখুনি বোঝা যাবে।) ধরা যাক, আমাদের 'ক'-তম কার্যক্রম যদি অকেজো হয় তাহলে 'ক'-এর ওপর কাজ করে কাঁচাকাজ উত্তর দেয় ০, আর, অন্যথা, উত্তর দেয় ১। সংক্ষেপে :

কাঁচাকাজ [ক]=০, যখন কাজ [(ক)···]= ?
এবং কাঁচাকাজ [ক]=১, অন্যথা।

ভালো কথা! কিন্তু পেনরোজের অনুসরণে এবার আমরা আরেকটি কার্যক্রম গল্পটার ভেতর নিয়ে আসব। এটির নাম হবে পাকাকাজ, আর সংজ্ঞাটা হবে এরকম :

পাকাকাজ [ক]= কাজ [(ক) ক]× কাঁচাকাজ [ক]

পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'ক'-এর ওপর পাকাকাজ-এর ক্রিয়ার ফল হল 'ক'-এর ওপর "যথাক্রমে" কাঁচাকাজ ও কাজ [(ক)···]-এর ক্রিয়ার ফল দুটির গুণফল। স্পষ্টতঃই এ একটা কার্যক্রম। আর তাই, 'ক'-এর ওপর এর ক্রিয়ার ফলের সংগে ১ যোগ করলেও আমরা পাব কোনো একটা কার্যক্রমের ফল! ধরা যাক সেটা হল 'ক'-এর ওপর আমাদের তালিকার খ-তম কার্যক্রমের ক্রিয়ার ফল। সাংকেতিক ভাষায় :

কাজ [(খ) ক] = ১+পাকাকাজ [ক]

এখানে 'ক'-এর জায়গায় 'খ' বসালে নিয়ম অনুযায়ী আমাদের পাওয়া উচিত 'খ'-এর ওপর খ-তম কার্যক্রমেরই ক্রিয়ার ফল।

কিন্তু গল্পটা জমে ওঠে এখানেই! যদি আমরা ধরে নিই যে খ-তম কার্যক্রম অকেজো নয়, তাহলে 'ক'-এর জায়গায় 'খ' বসালে পাই :

কাজ [(খ) খ] = ১+কাজ [(খ) খ]

যা অসম্ভব! তাহলে ধরা যাক কার্যক্রমটা অকেজো। সেক্ষেত্রে 'ক'-এর জায়গায় 'খ' বসালে আমরা পাব :

? = ১+০

যা কিছু কম অসম্ভব নয়!

দেখা যাচ্ছে যে সমাপন-সমস্যার ঈপ্সিত কার্যক্রমের অস্তিত্ব ধরে নিলে আমরা এমন কিছু ফলের সম্মুখীন হই যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এর মানে অবশ্যই এই যে ঐ কার্যক্রমের অস্তিত্ব অসম্ভব! অর্থাৎ সাধারণভাবে কখনোই কোনো কার্যক্রমের সাহায্যে স্থির করা সম্ভব নয় কোনো গাণিতিক কার্যক্রম আদৌ কার্যকরী হবে কি না। এভাবেই বোঝা যায় যে হিল্‌বার্টের স্বপ্নের সার্বিক অ্যালগরিদ্‌ম্‌ আসলে একটি আকাশকুসুম!

গ্যোয়েডেল্‌ উপপাদ্য এবং...

হিল্‌বার্টের স্থিরীকরণসমস্যার ওপর সবচেয়ে বিধ্বংসী আঘাতটি হানেন অস্ট্রিয় গণিতবিদ্‌ কুর্ট্‌ গ্যোয়েডেল্‌ তাঁর একটি উপপাদ্যের মাধ্যমে। আমাদের আলোচনার মূল বিষয়ের দিক থেকেও সুদূরপ্রসারী এই উপপাদ্যের তাৎপর্য।

হিল্‌বার্ট্‌ আসলে চেয়েছিলেন এমন একটি সম্পূর্ণ ও স্ববিরোধমুক্ত আকারাত্মক (formal) গাণিতিক ব্যবস্থা বা সিস্টেম্‌ গড়ে তুলতে যা গণিতের যেকোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রের (যেমন ধরুন, পাটিগণিতের) সমস্ত সত্যগুলিকেই ধারণ করবে। গ্যোয়েডেল্‌ উপপাদ্য ঠিক উল্টো কথা বলে! ১৯৩১ সালে মাত্র পঁচিশ বছরের তরুণ গ্যোয়েডেল্‌ এই উপপাদ্যটিতে প্রমাণ করেন যে, কোনো আকারাত্মক ব্যবস্থা বা সিস্টেম্‌ই সম্পূর্ণ হতে পারে না—এই অর্থে যে সিস্টেম্‌টির পরিধিভুক্ত সবকটি বাক্যের সত্যিমিথ্যে কখনোই সিস্টেম্‌টির অন্যান্য বাক্যগুলোর সাহায্যে পুরোপুরি নির্ণয় করা যায় না! অর্থাৎ কিছু বাক্য থেকেই যায় যেগুলির সত্যতা সিস্টেম্‌টির দ্বারা নির্ণেয় নয়। এই ধরনের বাক্যগুলিকে আমরা বলব গ্যোয়েডেল্‌ বচন। এককথায়, গ্যোয়েডেল্‌ প্রমাণ করেন যে যেকোনো আকারাত্মক গাণিতিক ব্যবস্থাতেই অন্তত একটি গ্যোয়েডেল্‌ বচন থাকবে। পেন্‌রোজের অনুসরণে আমরা এবার সাধারণ বীজগণিতের ক্ষেত্রেই উপপাদ্যটির আলোচনা করব। তবে তার আগে আর একটু প্রস্তুতির দরকার হবে আমাদের।

একটি আকারাত্মক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো মোটামুটি এরকম। প্রথমতঃ, ব্যবস্থাটিতে কিছু সুসংজ্ঞাত অক্ষর, রাশি, ক্রিয়াসূচক ও অন্যান্য সাংকেতিক চিহ্ন প্রভৃতির একটি নির্দিষ্ট বর্ণমালা থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবস্থাটিতে থাকতে হবে কিছু স্বতঃসিদ্ধ এবং কিছু প্রাথমিক সূত্র ও নিয়মাবলী। তৃতীয়তঃ, ব্যবস্থাটিতে থাকবে কিছু বচন ও উপপাদ্য—যেগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও সূত্রগুলি থেকে সত্য অনুমান হিসেবে প্রমাণযোগ্য হবে। লক্ষ্য করুন যে এখানে একটি বচনের সত্যতা বলতে তার এই প্রমাণযোগ্যতাকেই ধরা হয়।

এখানেও কিছু প্রতীক ব্যবহার করব আমরা। যেমন, স্বরবর্ণ দিয়ে আমরা বোঝাব

বচনগুলোকে, আর ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে বিভিন্ন সংখ্যাকে। কোনো বচনের সংজ্ঞা বিস্তারিতভাবে লেখার সময় আমরা লিখব এইভাবে : অ → "..." । এখানে সংজ্ঞাটি লেখা হবে তীর চিহ্নটির ডানদিকে, উদ্ধরণ চিহ্নের ভেতর। অনেক সময় একটি বচন এক বা একাধিক রাশির মানের ওপর নির্ভর করে। যেমন, এই বচনটি :

অ → "ক + খ = ফ"

এখানে 'ফ'-এর মান ০ হলে আমরা বুঝব 'ক' ও 'খ'-এর যোগফল ০ ; আবার ফ = ৫ হলে বুঝব যোগফলটা হল ৫, ইত্যাদি। অর্থাৎ এখানে 'অ'-বচনটি 'ফ'-এর মানের ওপর নির্ভর করে, বা, পরিভাষায় বললে, ফ-এর অপেক্ষক। এটা বোঝানো হবে অ (ফ) প্রতীকটির সাহায্যে। সবশেষে, ট্র্যারিং যন্ত্রের গল্পের ঐ তালিকাটার মতো এখানেও দরকার হবে প্রাসংগিক আকারাত্মক ব্যবস্থাটির সবকটি বচনের একটা কাজ-চলা তালিকার ধারণা। এরকম একটা তালিকার কথা মনে রেখে আমরা অ (ফ) ল প্রতীকটি দিয়ে বোঝাব আমাদের ব্যবস্থার ল-তম বচনটিকে, যেটি কিনা ফ-এর অপেক্ষক।

ব্যস্ ! আমাদের প্রস্তুতির এখানেই ইতি ! এবার সরাসরি উপপাদ্যটির ভেতরে যাওয়া যেতে পারে।

লক্ষ্য করুন এই বচনটি : "অ (র) র বচনটি প্রমাণহীন"। বচনটিতে বলা হচ্ছে যে আমাদের সিস্টেমের র-তম বচনটি— যেটি আবার 'র'-এর অপেক্ষক— এমন একটি বচন যার কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্যই এটি একটি যথার্থ বচন। মানে, আকারাত্মক ভাবে, গঠনরীতির দিক থেকে। (পেন্‌রোজ দেখিয়েছেন, গাণিতিকভাবে গ্রাহ্য এরকম অনেক বচন তৈরী করা যায়।) ধরা যাক এটি আমাদের ব্যবস্থাটির ব-তম বচন। আবার বচনটি র-এর অপেক্ষকও বটে। তাই আমরা লিখতে পারি :

অ (র) ব → "অ (র) র বচনটি প্রমাণহীন"

যেহেতু বচনটি 'র'-এর অপেক্ষক অতএব এখানে 'র'-এর জায়গায় 'ব' বসালেও একটি যথার্থ বচন পাওয়া যাবে। তখন আমরা পাবো :

অ (ব) ব → "অ (ব) ব বচনটি প্রমাণহীন"

আলোচনার সুবিধের জন্যে আমরা এই শেষ বচনটির নাম দিলাম ঐ। মজাটা এই ঐ

বচনটি নিয়েই! সেটা ধরা পড়বে যদি আমরা ঐ বচনটির সত্যতা আমাদের ব্যবস্থাটির অন্যান্য বচনের সাহায্যে নির্ণয় করতে চেষ্টা করি!

ধরা যাক ঐ বচনটি সত্য। অতএব আমাদের ব্যবস্থাটির কোনো-না-কোনো বচনগুচ্ছ ঐ বচনটিকে সত্য বলে প্রমাণ করবে। কিন্তু বচনটির সংজ্ঞাতেই বলা হচ্ছে যে তেমন কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং বচনটি আসলে অসত্য! (আমাদের 'স্ববিরোধহীন' ব্যবস্থা তাহলে অন্তত একটি অসত্য বচনকে সত্য বলে প্রমাণ করে!) কিন্তু তা তো মেনে নেওয়া যায় না! বরং, ধরা যাক ঐ অসত্য। তাহলে বচনটির অস্বীকৃতি অবশ্যই সত্য। অর্থাৎ, "ঐ বচনটি প্রমাণহীন" একথা সত্য হতে পারে না। অতএব বচনটির অবশ্যই কোনো প্রমাণ আছে। অতএব ঐ আসলে সত্য! আবার গণ্ডগোল! এই গোলমেলে স্ববিরোধ থেকে বোঝা যায় যে আমাদের পূর্বানুমানটিই ভুল। অর্থাৎ ঐ বচনটির সত্যতা আমাদের ব্যবস্থাটির দ্বারা নির্ণেয় নয়। এভাবেই মোটামুটি প্রমাণিত হয় গ্যোয়েডেলের উপপাদ্যটি।

লক্ষ্য করুন, এখানে এই ঐ বচনটি হল একটি গ্যোয়েডেল্ বচন— যার কথা আমরা একটু আগেই বলেছি। গ্যোয়েডেলের মতে, যতো নিখুঁতভাবেই একটি আকারাত্মক গাণিতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক না কেন, সর্বদাই ব্যবস্থাটির মধ্যে অন্ততঃ একটি গ্যোয়েডেল্ বচন থাকবে। যেমন, ঐ বচনটিকে আমাদের ব্যবস্থাটির স্বতঃসিদ্ধগুলির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে আমরা যদি নতুন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, তাহলে সেই নতুন ব্যবস্থাটিতেও অন্ততঃ একটি গ্যোয়েডেল্ বচন পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ একটি আকারাত্মক ব্যবস্থার তত্ত্বগতভাবে (এবং গণনীয়ভাবে) অসীমসংখ্যক পুনর্নির্মাণের পরেও আমরা দেখা পেতে থাকব এই গ্যোয়েডেল্ বচনগুলির। ফলে, গ্যোয়েডেলের উপপাদ্যটির যাথার্থ্য সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি।

... এবং যুক্তিবিদ্যার স্বপ্নভঙ্গ

'সত্যতা' আর 'প্রমাণ্যতা'— এই দুটিকে সমার্থক না ভাবলে কিন্তু কোনো স্ববিরোধের মধ্যে পড়তে হয় না আমাদের। গ্যোয়েডেল্ উপপাদ্যের গল্পটা নিয়ে একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে এই ঐ বচনটি সত্য। যদিও তার প্রমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাটিতে নেই। কিন্তু বচনটিতেও ঠিক এ-কথাই বলা হচ্ছে। তাই এখানে কোনো স্ববিরোধ নেই। এভাবে বোঝা যায় যে গাণিতিকভাবে সত্য একটি বচনও কোনো কার্যক্রমের নাগালের বাইরে থাকতে পারে। গণিতের এমন অনেক প্রশ্ন নিয়ে পেনরোজ আলোচনা করেছেন যাদের উত্তর কোনো কার্যক্রমের নাগালের বাইরে। ঐ আলোচনায় আমরা আর যাচ্ছি না।

এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে পেন্‌রোজের মতে গণিতের "খুব সংকীর্ণ ও সীমিত" একটা অংশই কার্যক্রমদের দখলে রয়েছে !

অতএব আকারাত্মক গণিতের (এবং তুলনীয় মতবাদগুলির) প্রবক্তাদের দেওয়া সত্যের সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ । আর, সত্যের অন্বেষণের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক অ্যাল্‌গরিদ্‌ম্‌ নয়, কোনো সিস্টেমের বাঁধাধরা ছকের অন্ধ অনুসরণ নয়, বরং সমস্যাবিশেষের তাৎপর্যের অনুধাবনই বেশি জরুরী সহায়ক । এই অনুধাবনের জন্যে দরকার অন্তর্দৃষ্টির । কিন্তু, পেন্‌রোজ দেখিয়েছেন, কোনো অ্যাল্‌গরিদ্‌মের পক্ষেই সম্ভব নয় এই অন্তর্দৃষ্টির নাগাল পাওয়া !

উঠে আসে আরও একটা কথা । আমাদের মধ্যে যারা কোনো তাত্ত্বিক ব্যবস্থার ধ্রুব সম্পূর্ণতায় বিশ্বাসী, অথবা মনে করি যে আমাদের সমর্থন পাওয়া অমন কোনো একটি ব্যবস্থা সব সময়েই এমনভাবে সত্যের পথনির্দেশ দিয়ে যেতে থাকবে যে কখনোই সত্যের কোনো অংশ ব্যবস্থাটির গণ্ডীর বাইরে থাকতে পারবে না— তাদের কাছে গ্যোয়েডেলের উপপাদ্যটি নিয়ে আসে তাদের ধারণা আমূল পাল্টানোর জন্যে এক জোরালো আহ্বান । একথাটা অন্ততঃ সোজা যে গণিত বা যুক্তিতত্ত্বের জায়গাটা জীবনের অন্যান্য অনেক জায়গার তুলনায় অনেক বেশি সংহত । সত্যের অন্বেষণ এখানেই যদি গ্যোয়েডেল্‌-বর্ণিত সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে, তাহলে অবশ্যই অন্যান্য জায়গায় (— তথাকথিত 'সমাজ-বিজ্ঞান', নীতিশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতির জায়গায়—) ঐ অন্বেষণকে অনেক বেশি ঝামেলা পোয়াতে হবে !

পেন্‌রোজের মতে গাণিতিক সত্য— এবং সাধারণভাবে সত্য— এক অর্থে দেশ-কালাতীত । একজন সক্রিয় বৈজ্ঞানিক ও গণিতবিদ্‌ হিসেবে তিনি মনে করেন যে মানুষের যাবতীয় চিন্তা ও এষণা যেন কোনো এক "চরম, বহিঃস্থ ও শাশ্বত" সত্যের দিকে "চালিত হয়ে চলেছে"— যে সত্য শুধু মানবনিরপেক্ষই নয়, বরং স্বয়ম্ভূ । আমাদের চেতনা কখনো কখনো পারে সত্যের এই উৎসের সংগে যোগাযোগস্থাপন করতে । আর, তখনই খুলে যায় আমাদের অন্তর্দৃষ্টি— যা আমাদের চেতনাকে দেখিয়ে দেয় সত্যের নতুন কোনো অংশ । সংগীত, ভাস্কর্য, চিত্র, কাব্য এসবের মহৎ শিল্পকর্মেও কালাতীত এক সত্যের খোঁজ পেয়েছেন পেন্‌রোজ ! সত্যের এই ধারণাকে গ্রীক মনীষী প্লাতো-র মত বলে বর্ণনা করেছেন তিনি । তবে বর্তমান প্রতিবেদকের মনে হয়েছে যে সাম্প্রতিক ও প্রাচীন আরো অনেক ভাবুকের ভাবনার আদল আসে এখানে । জিষ্ণু কৃষ্ণমূর্তির কথাই ধরুন !

যাই হোক, কোনো কম্পিউটারের পক্ষেই কিন্তু এভাবে সত্যের 'আবিষ্কার' সম্ভব নয় ।

কারণ কম্পিউটারের কাজ সব সময়েই বন্দী কোনো কার্যক্রমের খাঁচায়। প্রশ্ন হল : কালবদ্ধ হয়েও চেতনা কীভাবে পারে কালাতীত এই সত্যগুলিকে ছুঁতে? পেন্‌রোজ এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন পদার্থবিজ্ঞানে।

পদার্থ, চেতনা ও এক অজানা যোগসূত্র

বর্তমান প্রতিবেদক অবশ্য বিজ্ঞানে অশিক্ষিত। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রসংগে শুধু পেন্‌রোজের মতকেই এখানে অনুসরণ করা হয়েছে। তবে চেষ্টা করা হয়েছে মূল আলোচনার জন্যে জরুরী বিষয়গুলি অল্প কথায় বলার।

একটু আগেই বলা কথাটার খেই ধরে প্রথমেই বলা যায় যে পদার্থবিজ্ঞান এ তাবৎ মহাবিশ্বের যে গাণিতিক কাঠামোর খোঁজ পেয়েছে—তার সব সত্যই ঐ দেশকালাতীত প্লাতো-বিশ্বের অধিবাসী! উল্টো দিক থেকে হয়তো এ-ও ভাবা যায় যে প্লাতো-বিশ্বের সত্যগুলি সত্তারূপ পায় আমাদের এই অস্তিত্বশীল মহাবিশ্বে। আর গাণিতিক সত্যের পরিধির বেশির ভাগটাই কার্যক্রমের নাগালের বাইরে থাকায় জড়প্রকৃতিতেও অ-কার্যক্রম-ভিত্তিক বা অ-গণনীয় কিছু উপাদানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পেন্‌রোজের মতে, মহাবিশ্বে চেতনার অস্তিত্বের সংগে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো এই সম্ভাবনাটি। কারণ, তাঁর মতে, চেতনা নিজেই এক ধরনের অগণনীয় সত্তা—যা নিজে দেশকালবদ্ধ হয়েও দেশকালের বাইরের ঐ সত্যগুলিকে জানতে পারে। পেন্‌রোজ চেতনাকে জড়বিশ্ব ও ঐ সত্যলোকের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে বর্ণনা করেন। আর, চেতনার মধ্যে দেশকালাতীত কিছু উপাদানের সম্ভাবনাটাও ধরা পড়ে এই ভাবনায়।

এখন, পদার্থবিজ্ঞান মহাবিশ্ব সম্পর্কে এ-অবধি যা-কিছু সত্যের খোঁজ দিয়েছে তাদের মধ্যে চেতনা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। কেন? সম্ভবতঃ এ-কারণে যে জড়বিশ্বে চেতনার মতো একই সংগে দেশকালবদ্ধ ও দেশকালাতীত কোনো সত্তার উপস্থিতির জন্যে দেশ-কালের যে ধারণার দরকার তার খোঁজ এখনো মেলেনি! বিশেষ করে ঝামেলা হয়েছে এই কাল বা সময়ের রহস্যটা নিয়ে। সচেতন অভিজ্ঞতায় আমরা সময়কে এক ধরনের অ-বিপরীতায়নীয় (ir-reversible) প্রবাহ হিসেবে দেখি। অথচ, আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পরেকার ব্রহ্মাণ্ডবিজ্ঞানে মহাবিশ্বে অমন কোনো সময়-প্রবাহের সামগ্রিক অস্তিত্ব মানা হয় না! তাছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের বেশির ভাগ গাণিতিক সূত্রের মধ্যেই এক ধরনের সময়-প্রতিসাম্য (time symmetry) দেখা যায়। তাপ-গতিবিদ্যায় অবশ্য প্রকৃতির সময় অ-প্রতিসাম্যের এক ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাতে কিছুটা বোঝা যায় কেন আমরা বাচ্চা থেকে বুড়ো হই, এবং উল্টোটা কখনোই হই না; অথবা, কেন কাঁচের গেলাস পড়ে

ভেঙে যায়, এবং কখনোই ভাঙা গেলাস নিজে থেকে আবার জুড়ে যায় না। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দরকার হয় এই ব্যাখ্যাটারও একটা ব্যাখ্যা। এদিকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের ঐকান্তিক (singular) দশাগুলির তুলনামূলক আলোচনায় আবার এই সময়-অ-প্রতিসাম্যের ব্যাপারটা অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। যাতে বোঝা যায় যে একটি দশা 'আদিম' ও অপরটি 'অন্তিম'! কিন্তু এই ঐকান্তিক দশাগুলোয় পুরো দেশ-কালই হারায় তার অস্তিত্ব! ফলে নতুন কোনো তত্ত্বের কথা ভাবতেই হয়—যে তত্ত্ব দেশকালের এমন ধারণা নিয়ে আসবে যাতে সময়ের এই রহস্যের ব্যাখ্যাটা পাওয়া যায়। পেন্‌রোজ এখনো না-পাওয়া এই তত্ত্বটির নাম দিয়েছেন **'Correct Quantum Gravity Theory'**— যাকে বাংলায় বলা যায় 'যথার্থ তন্মাত্র মহাকর্ষ তত্ত্ব', সংক্ষেপে **'যতমত'**।

পেন্‌রোজের অনুমান, নতুন এই তত্ত্বও সময়ের সমস্যার সংগে আরো কিছু মৌলিক সমস্যার সমাধান দিতে পারবে—আর এই সমাধানগুলি থেকেই পাওয়া যাবে চেতনার রহস্যের কিছু প্রাথমিক ব্যাখ্যা। তাঁর মতে এই সমাধানগুলি প্রধানতঃ উঠে আসবে অধিপারমাণবিক পদার্থের তত্ত্ব বা তন্মাত্র তত্ত্বের (Quantum Theory) কিছু মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। (এখানে 'তন্মাত্র' শব্দটি ঠিক কণাদপ্রদত্ত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এখানে 'তন্মাত্র' মানে 'তং মাত্র'— যেখানে 'মাত্র' শব্দটিতে পদার্থের **অধিপারমাণবিক** অবস্থার অতিক্ষুদ্রতাকে বোঝানো হয়েছে। প্রসংগতঃ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু একবার 'কোয়ান্টাম্ থিওরি'-র বাংলা করেছিলেন 'মাত্রাবাদ'!)

এদিকে তন্মাত্র তত্ত্বের নিজের ঘরেই ঝামেলা কম নয়! এই তত্ত্বে পদার্থের তান্মাত্রিক সত্তাকে মূলতঃ দু-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যায় এই সত্তা এক ধরনের তরঙ্গের মতো, আর অপর ব্যাখ্যাটিতে কিছু ছাড়া-ছাড়া তান্মাত্রিক কণার মতো। প্রথম ব্যাখ্যাটার পদ্ধতিটিকে বলা যাক তরংগ-বাচক বা ত পদ্ধতি, আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলা যাক কণা-বাচক বা ক পদ্ধতি। যাইহোক, পদার্থের এই দুরকম ব্যবহারের ব্যাপারটা সত্যিই অস্বাভাবিক। পেন্‌রোজের মতে, যতমত-ই পারবে অস্বস্তিটা কাটাতে। তখন এই পদ্ধতি দুটি মিলিত হবে নতুন একটা পদ্ধতির ভেতর।

খুব সংক্ষেপে ও সহজ করে বললে, ত পদ্ধতিতে আমরা পাই কোনো তন্মাত্রকণার সম্পূর্ণ গতিবৃত্তির, অর্থাৎ তার বিবিধ অবস্থান ও ভরবেগসমূহের বিবর্তনের, একটা সারাংশধর্মী ছবি— যাতে এই বিবিধ সম্ভাব্য অবস্থানের (বা ভরবেগের) প্রতিটিকে অন্যান্য সম্ভাব্য অবস্থানগুলির (বা ভরবেগগুলির) সংগে এক ধরনের উপর্যুপরি-অবস্থানের (superposition) মধ্যে বিধৃত হিসেবে ভাবা যায়। এখন,

যখনই অমন একটি কণার অবস্থান বা ভরবেগ জানার জন্যে কণাটির ওপর কোনো পর্যবেক্ষণ করা হয়— তখনই নায়কের ভূমিকা নেয় ক পদ্ধতিটি ! তখন দেখা যায় যে কণাটি তার বিবিধ সম্ভাব্য অবস্থানের (বা ভরবেগের) যে-কোনো একটিতে বিদ্যমান ! মজা এই যে, কোন্ বিশেষ অবস্থানটি (বা ভরবেগটি) এভাবে নির্বাচিত হয়, সেটা কিন্তু গণনা করে বার করা সম্ভব নয় ! আর, কখনোই নিখুঁতভাবে কণাটির অবস্থান ও ভরবেগ দুটিকেই একই সংগে জানা সম্ভব নয় ! আরো মজার এই যে এমনকি ক পদ্ধতিটি নিজেই ত পদ্ধতিটি থেকে গণনীয়ভাবে নির্ণেয় নয় ! আর এখানেই পেন্‌রোজ খুঁজে পান জড় প্রকৃতির মধ্যে অ-গণনীয়তার কিছু দৃষ্টান্ত ! আমরা আগেই দেখেছি যে চেতনা নিয়ে আলোচনায় এসব দৃষ্টান্ত কাজে লাগাতে চান তিনি।

এছাড়াও, কিছু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে পদার্থের তাত্মাত্রিক ব্যবহার কল্পনাতীত-ভাবে বিস্ময়কর ! যেমন, কোনো তন্মাত্র-কণাকে (যেমন একটি ফোটন বা আলোক-কণাকে—) দেখা গেছে একই সময়ে দুটি জায়গায় উপস্থিত থাকতে— যে দুটি জায়গার ব্যবধানের একক মিলিমিটারের কয়েক শতাংশের মতো খুব কমও হতে পারে, আবার আলোকবর্ষের মতো ভয়াবহরকমের বিশালও হতে পারে ! (মনে রাখবেন, প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,২৮২ মাইল গতিবেগ নিয়ে আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব পেরোতে পারে— সেই ছোট্ট (!) দূরত্বটাকেই বলা হয় এক আলোকবর্ষ !) আবার, জানা গেছে, একই সময়ে একটি তন্মাত্র কণার ওপর পর্যবেক্ষণের ফলে প্রভাবিত হতে পারে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের আরেকটি বিশেষ তন্মাত্র কণার ব্যবহার। এ অর্থে যে প্রথমটির ওপর পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটা পাল্টে আবার পর্যবেক্ষণ করা হলে যদি তার ব্যবহারে কিছু হেরফের দেখা যায়, তাহলে দ্বিতীয়টির ব্যবহারও তৎক্ষণাৎ অনুরূপভাবে পাল্টে যায়— কণাদুটির মধ্যে কোনো বাহ্যিক তথ্য লেনদেনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে ! ব্যাপারটি আইন্‌শ্‌টাইন্-পদোল্‌স্কি-রোজেন্-এর ধাঁধাঁ বা ই. পি আর. ধাঁধাঁ (E. P. R. Paradox) নামে বিখ্যাত। আর এই ধাঁধাঁটি থেকে ধরা পড়ে অন্ততঃ তাত্মাত্রিক অবস্থার পদার্থের এক অস্থানিক নিয়ন্ত্রিতার (non-local determinacy) কথা। এই ব্যাপারটাকেও চেতনা-সংক্রান্ত আলোচনায় দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন পেন্‌রোজ !

তন্মাত্র তত্ত্বের এই ভুতুড়ে (!) ঘটনাগুলো আমরা যে বৃহৎ বস্তুর বেলায় (—যেমন, ক্রিকেট বল বা হাতি বা মানবদেহের বেলায়—) দেখতে পাই না— এটাও অবশ্যই বিরাট এক রহস্য ! পেন্‌রোজের মতে, এই রহস্যেরও সমাধান দেবে যন্ত্রমন্ত্র— যা থেকে পাওয়া যাবে পদার্থ বিজ্ঞানের এই বড়ো-র তত্ত্ব আর ছোট-র তত্ত্বের মিলনের এখনো না-পাওয়া পথটা। যাইহোক, ওপরের এই ভুতুড়ে উদাহরণগুলোতেও লুকিয়ে

রয়েছে "একই সময়ে" কথাটি। সময়ের সমস্যাটাই এভাবে ফিরে আসছে আবার। পেন্‌রোজ দেখিয়েছেন যে তন্মাত্র তত্ত্বের যে পদ্ধতিতেও এক ধরনের সময় অ-প্রতিসাম্যের খোঁজ মিলেছে। যন্ত্রমস্ত অবশ্যই এরও একটা ব্যাখ্যা দেবে। আর চেতনা যেন সময়কে সাধারণতঃ একমুখী প্রবাহ হিসেবে দ্যাখে, হয়তো তারও একটা হদিশ মিলবে এখানেই!

মস্তিষ্ক, কম্পিউটার ও চেতনার তন্মাত্র তত্ত্ব

জোকৃধীবাদী ও তুলনীয় ভাবুকদের মতে আমাদের মস্তিষ্ক অতিজটিল এক প্রাকৃতিক কম্পিউটার! মস্তিষ্কের শরীরতাত্ত্বিক বিবরণ থেকে কথাটা অবশ্য খাঁটি বলেই মনে হয়। কিন্তু পেন্‌রোজ এখানেও খুঁজে পেয়েছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ-কার্যক্রমভিত্তিক ক্রিয়া!

স্নায়ুকোষদের (neurons) গল্পটা এখানে একটু বলতে হবে। এদের সাহায্যেই মস্তিষ্ক চালায় তার যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ। প্রতিটি স্নায়ুকোষের কেন্দ্রের সংগে জোড়া থাকে অনেকগুলো কেন্দ্রমুখী বা অন্তর্গ স্নায়ুতন্তু, আর অনেকগুলো কেন্দ্রবিমুখী বা বহির্গ স্নায়ুতন্তু। প্রতিটি বহির্গ তন্তুর শেষাংশ আবার অন্যান্য স্নায়ুকোষের কেন্দ্র বা অন্তর্গ তন্তুদের প্রায় ছুঁয়ে থাকে— 'প্রায়' মানে, এক মিলিমিটারের চল্লিশ সহস্রাংশের মতো ফাঁক রেখে! অতিসূক্ষ্ম এই ফাঁকগুলিতেই ঘটে স্নায়ুকোষ থেকে স্নায়ুকোষে মস্তিষ্কের যাবতীয় খবর দেয়া-নেয়া। ফাঁকটা বাড়লে বা কমলে বন্ধ হয় এই যোগাযোগ। আর, খবর দেয়া-নেয়ার কাজটা চলে এক ধরনের তড়িৎ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। এই প্রক্রিয়াকে আবার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বহির্গ তন্তুদের শেষাংশ থেকে নিঃসৃত কিছু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ, যাদের বলা হয় স্নায়ব-প্রেরক (neuro-transmitter)। উত্তেজক স্নায়ব-প্রেরক উদ্দিষ্ট স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করে, প্রশমক স্নায়ব-প্রেরক প্রশমিত করে ইত্যাদি।…

দেখা গেছে যে বহির্গ তন্তুগুলো অনেক সময়ে অন্তর্গ তন্তুদের গায়ে গজিয়ে ওঠা কিছু অতিসূক্ষ্ম কাঁটা বা শোঁয়ার (spines) সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে (—অবশ্যই, ঐ সঠিক ফাঁকটা বজায় রেখে)! এই শোঁয়াগুলো ভারি মজার! প্রথম কথা, এরা হঠাৎ হঠাৎ গজিয়ে ওঠে! আবার হঠাৎ হঠাৎ লম্বায় বেড়ে যায় বা কমে যায়! আর এর ফলে, মস্তিষ্কের ভেতরে আন্তর্কৌষ যোগাযোগের গোটা ব্যবস্থাটাই হঠাৎ হঠাৎ পাল্টে যায়! অবশ্যই, এভাবে নিজে থেকেই 'পাল্টে যাওয়া' যে-কোনো কম্পিউটারের পক্ষেই অসম্ভব! এদিকে, ব্যাপারটা কিন্তু প্রকৃতির একটা নিছক খেয়াল নয়! অনেকের মতে এই ব্যাপারটাই স্মৃতির, বিশেষতঃ দীর্ঘকালীন স্মৃতির, উন্মেষের জন্যে দায়ী। চেতনার

কাজকর্মের জন্যে ব্যাপারটা তাই খুবই জরুরী। আর, পেন্‌রোজের মতে, ব্যাপারটা সম্ভবতঃ অ-কার্যক্রমভিত্তিক !

পাশাপাশি আরো একটা ব্যাপারের কথা বলেছেন পেন্‌রোজ। দেখা গেছে যে অনেক সময়ে স্নায়ব-প্রেরকেরা সরাসরি কোনো স্নায়ুকোষের প্রতি উদ্দিষ্ট না হয়ে আন্তর্কোষি তরলের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে প্রভাব ফেলে একসংগে অনেকগুলো স্নায়ুকোষের ওপর— যাদের একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব কোষগত মাপকাঠিতে বেশ খানিকটা হতে পারে। পেন্‌রোজ ব্যাপারটাকে অনেক সংখ্যক স্নায়ুকোষের অধিপারমাণবিক দশাগুলির মধ্যে এক ধরণের সামগ্রিক সামবায়িক প্রয়াস (global cooperative effort) বলে বর্ণনা করেছেন। আর, একে তুলনা করেছেন আধা-স্ফটিকের (quasi-crystal) গঠন প্রক্রিয়ার সংগে। তাঁর মতে, এক ধরনের অ-স্থানিক প্রভাব (non-local effect) এ-ধরনের সামবায়িক ক্রিয়াতেও কাজ করে।

আধা-স্ফটিক ? ১৯৪৪-র ডিসেম্বরে আবিষ্কৃত হয় এই অদ্ভুত জিনিসটি। পেন্‌রোজের মতে, এগুলি একটি একটি করে পরমাণু নিয়ে গণনীয়ভাবে দানা বাঁধে না, বরং দানা বাঁধে একই সংগে অনেকগুলি পরমাণুর মধ্যে এক ধরনের সামগ্রিক সামবায়িক ক্রিয়ার মাধ্যমে ! ক্রিয়াটি প্রথমতঃ পরিচালিত হয় তন্মাত্র তন্তুর ত পদ্ধতিতে। তখন পরস্পর সম্পর্কিত অনেকগুলি পরমাণুর অনেক ধরনের সম্ভাব্য বিন্যাস পরস্পরের এক উপর্যুপরি-অবস্থানের মধ্যে বিধৃত হিসেবে কাজ করে। এ-অবস্থায় প্রতিটি সম্ভাব্য বিন্যাসই আধা-স্ফটিকটির গঠনসমস্যার একটি সম্ভাব্য সমাধান। শেষে নায়কের ভূমিকা নেয় ক পদ্ধতিটি— যখন এই অনেকগুলি সম্ভাব্য বিন্যাসের মধ্যে যেকোনো একটি বিন্যাস, অথবা, আগের চেয়ে কম সংখ্যক বিন্যাসের একটি উপর্যুপরি-অবস্থান, নির্বাচিত হয়— দানা বাঁধতে থাকা আধা-স্ফটিকটির উপযুক্ত বিন্যাস হিসেবে। আর, এই শেষের নির্বাচনটি যে অ-গণনীয় তা আগেই বলা হয়েছে !

পেন্‌রোজের অনুমান, বিভিন্ন আবেগ ইত্যাদির ফলে মস্তিষ্কের আন্তর্কোষি তরলের মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া স্নায়ব-প্রেরকদের ঘনত্বের তারতম্যে অ-স্থানিকভাবে প্রভাবিত হতে পারে মস্তিষ্কের একাধিক স্নায়ুকোষের অন্তর্গ তন্তু ও তাদের গায়ে গজিয়ে ওঠা ঐ শোঁয়াগুলোর বাড়া-কমা। এখানেও পুরো ব্যাপারটা প্রথমে ঘটে চলে ঐ ত পদ্ধতিতে— বহু সংখ্যক কোষের অধিপারমাণবিক দশাগুলোর মধ্যে এক ধরনের সামগ্রিক সামবায়িক প্রক্রিয়ায়। এখন, আধা-স্ফটিকটি শেষবেশ গঠিত হয় কোনো বস্তুগত লক্ষ্যের (—যেমন শক্তির অবমীকরণের—) সিদ্ধি হিসেবে। মস্তিষ্কের বেলায় এই লক্ষ্যগুলি অনেক বেশি জটিল এবং বিবিধ অভিপ্রায় ও কামনার সংগে সম্পর্কিত হতে পারে। এসব অভিপ্রায়গুলি নিজেরাই আবার একই ধরনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে উঠে এসে থাকতে

পারে। এভাবে আসলে পুরো ব্যাপারটার অ-গণনীয়তা আরো বেড়ে যায়। আর শেষে, মস্তিষ্কের ভেতরে তড়িৎ-রাসায়নিক আন্দোলন যথেষ্ট পরিমাণ (—মানে, তাত্ত্বিক মাপকাঠিতে যথেষ্ট পরিমাণ !—) হলে সক্রিয় হয় ঐ ক পদ্ধতি। তখন আবার প্রাসংগিক সমস্যাটির অনেকগুলো সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে থেকে অ-গণনীয়ভাবে উঠে আসে একটিমাত্র সমাধান। (পুরো ব্যাপারটা ঘটে সম্ভবত এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে !) ঐ সমাধানটা আবার নতুন সংকেত পাঠিয়ে পুরো নাটকটা আবার শুরু করতে পারে। এভাবেই হয়তো উঠে আসে একের পর এক চিন্তা !··· অবশ্যই, এ-সবই অনুমান। তবু মস্তিষ্কের অ-গণনীয়তার একটা পরিষ্কার ছবি হয়তো পাওয়া যায় এখানে।

'ন মেধয়া' ?

চেতনা দিয়েই আমরা টের পাই যে আমরা আছি, জগৎ আছে ! চেতনা দিয়েই আমরা জানতে পারি যতো তথ্য ও তত্ত্বের ভেতরের সত্যকে ! বুঝতে পারি কোনো কার্যক্রমের কার্যকারিতা ! এ-থেকেও বোঝা যায় যে চেতনা নিজে সব কার্যক্রমের বাইরে। তাই যেসব মতবাদ একে প্রকৃতির অতিজটিল কোনো কার্যক্রমের একটা হঠাৎ-পাওয়া ও অদরকারী ফল বলে মনে করে সেগুলিকে ভুলই বলতে হয়। এ-ধরনের যান্ত্রিক ব্যবহারবাদের বিরুদ্ধে দার্শনিক আপত্তি আগেও অনেকে তুলেছেন (—যেমন জঁ পল্ সার্ত্র)। পেন্‌রোজ আরো একটু এগিয়ে খোদ আধুনিক বিজ্ঞানের এলাকা থেকেই দেখিয়ে দেন কেন ও কীভাবে চেতনা এক অ-কার্যক্রমভিত্তিক সত্তা— এবং ফলে কখনোই কোনো যান্ত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বোধ্য বা অনুকরণীয় নয়।

অন্তর্দৃষ্টি, উৎসাহ, নান্দনিক বিচার, চেতনার সামগ্রিকতা ও একত্ব, চিন্তার ভাষা-নিরপেক্ষতা প্রকৃতি বিষয়ের অভিজ্ঞতার প্রসংগে এসে এই কথাটিই আরো সরাসরি তুলে ধরেন তিনি। কীভাবে মোৎসার্ট্ এক লহমায় প্রত্যক্ষ করতে পারেন একটা গোটা সিম্‌ফনিকে ? কীভাবেই বা একটি বাসে ওঠার মুহূর্তে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ও অপ্রত্যাশিতভাবে পোঅ্যাঁকারে পেয়ে যান দুরূহ এক গাণিতিক প্রশ্নের উত্তর— যা তিনি ঐ ঘটনার অনেক আগে অনেক দিনের একাগ্র চিন্তাতেও খুঁজে পাননি ? পেন্‌রোজের জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। অনেকের জীবনেই !

কিন্তু, চেতনা কী ? এ-প্রশ্নের দিকে যাননি পেন্‌রোজ ! তার কারণ বোধহয় এই যে চেতনা কোনো বস্তু নয়, তড়িৎ বা মহাকর্ষের মতো কোনো জড়শক্তি নয়, তার কোনো দৈশিক (spatial) অবস্থান বা ভরবেগ নেই— এবং ফলে নেই কোনো কালগত অবস্থানও ! মস্তিষ্ক চেতনার আধার অনেকটা যেমন একটি ডিস্‌প্লে বোর্ডে লেখা কোনো

বিজ্ঞাপনের আধার হল বোর্ডটির সাথে লাগানো কোনো বিশেষ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপনটার অর্থ (— আর সেটাই তো বিজ্ঞাপন !—) বোর্ডটির কোথাও কিন্তু দৈশিকভাবে অবস্থিত নয় !

চেতনা যে এক অর্থে কালাতীত, তা পেন্‌রোজ-ও জানেন। চেতনাই ঐ প্লাতো-বিশ্বের সংগে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেয় ! আর, চেতনার প্রধানতম কাজ সম্ভবতঃ তাৎপর্যের অনুধাবন। কিন্তু তাৎপর্য-ও কি কালাতীত নয় ? (এ-নিয়ে গভীর ভাবনা-চিন্তা করেছেন পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড্ বম্। তাৎপর্যের তাৎপর্য বুঝতে গিয়ে তিনিও ফিরে তাকিয়েছিলেন মহাবিশ্বের এমন এক অসীম উৎসের দিকে— যা দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে যায় !) তাছাড়া চেতনার মধ্যে সময়ের প্রত্যক্ষণের নানা বৈশিষ্ট্য থেকেও ফিরে আসে এই কালাতীত বিষয়ের প্রসংগ। কীভাবে আমরা মুহূর্তের স্মৃতিচারণায় জীবনের অনেকটা অংশের, বা পুরোটার, গোটা ছবিটা দেখতে পাই ? এমনকি, পেন্‌রোজের মতে, চেতনার মধ্যে কোনো 'ভবিষ্যৎ' অনুভবের পক্ষে কোনো 'অতীত' চিন্তাকে প্রভাবিত করাও সম্ভব ! কারণ, চেতনা এক অর্থে কালাতীত ! পেন্‌রোজের অকপট বক্তব্য এই যে দেশকালের বর্তমান ধারণার মধ্যে চেতনাকে বোঝা সম্ভব নয়। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আশা করেন যে যতমত-ই এ-বিষয়ে নতুন পথ দেখাবে। অবশ্যই, অমূলক নয় এই আশা !

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ! লক্ষ্য করুন, এখানে চেতনাই জ্ঞাতা আর চেতনাই জ্ঞেয়। তাই এখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যখন আলাদা তখন জ্ঞান অবশ্যই অসম্পূর্ণ ! কিন্তু তাহলে জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ হবে তখন এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-র মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকবে কী করে ? কী করেই বা তখন থাকবে কোনো জ্ঞাতা ? (নাকি এ-প্রশ্নও দেশকালের চলতি ধারণা থেকেই উঠে এসেছে ?) □